নোবেল সাহিত্য পুরস্কার ২০০৭ ডরিস লেসিং

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ

''...নারী জীবনের এপিক কথাকার তাঁর সংশয়, তেজ এবং দূরদৃষ্টির আলোয় এই বিদীর্ণ সভ্যতাকে এক সমীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়েছেন।'' (সুইডিশ সাহিত্য আকাদেমি, স্টকহলম, ১১.১০.০৭)

প্রকাশ্যে নোবেল পুরস্কারটি ঘোষণার পরেই সুইডিশ সাহিত্য আকাদেমির স্থায়ী সম্পাদকের আশু কর্তব্য, নোবেল বিজয়ীকে দূরভাষে যোগাযোগ করে সরাসরি পুরস্কারের সংবাদটি তাঁকে জানানো। কিন্তু স্টকহলম থেকে ফোনে ডরিস লেসিংকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না আকাদেমি সম্পাদক। অগত্যা লেসিং - এর প্রকাশকের কাছে খবর পান, লেসিং গিয়েছেন এক পরিচিতকে দেখতে। সঙ্গে আছেন তাঁর পুত্র পিটার লেসিং। যখন তাঁরা বাড়ি ফিরলেন এবং ট্যাক্সি থেকে ডরিস লেসিং অবতরণ করলেন, হাতে তাঁর শাকসব্জির ব্যাগ। মুখের সামনে এগিয়ে এলো প্রতীক্ষিত সাংবাদিকদের মাইক্রোফোন। তাঁদের মধ্যে রয়টারের সাংবাদিক ডরিস লেসিংকে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদটি প্রথম জানান এবং সংবাদটি পেয়ে ডরিস লেসিং -এর তৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কী তা তাঁর নিজের ভাষায় লিখছি— 'I have won all the prize in Europ, every bloody one...its a Royal flush'। তারপর রয়টারের সাংবাদিক লেসিংকে সুইডিশ আকাদেমি পুরস্কারের সপক্ষে যে যুক্তিটি দিয়েছেন তা তাঁকে বলেন। ''...that epieist of the female experience...'' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তাৎক্ষণিক উত্তর : 'Its ridiculous...আমি বুঝতে পারছি না। ওঁরা কী বলতে চাইছেন। আমি কখনও বুঝতে পারি না মানুষ কেন মানুষকে পুরুষ এবং নারী হিসাবে বিভক্ত করবে।...' ডরিস লেসিংকে যাঁরা 'ফেমিনিস্ট' লেখিকা হিসাবে চিহ্নিত করতে চান, তাঁদের কাছেই তিনি বারবার এরকম প্রশ্ন তুলে ধরেন। ২০০১ সালে লেসিং এই বলে বিতর্কের কারণ ঘটিয়েছিলেন যে, 'আধুনিক নারী খুবই আত্মতুষ্টি ও অস্মিতাপূর্ণ মনোভাবে আচ্ছন্ন এবং পুরুষদের দোষ খুঁজতে মুখিয়ে আছেন।' তিনি আরো বলেন, 'আধুনিক পুরুষদের আধুনিক মেয়েরা অত্যন্ত হেলাফেলা মনে করেন এবং তাঁদের স্বামীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখেন।'

পুরস্কার ঘোষণার পরে এক সাংবাদিক সভায় আকাদেমিক সম্পাদক হোরাস এঙ্গদল বলেন,— ডরিস লেসিংকে এ বছর নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচকরা তাঁর সাহিত্যের গুণগাণ প্রসঙ্গে তেমন কোনও প্রশ্ন তুলবেন না। প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেবে কেন তাঁকে এতদিন অপেক্ষা করতে হল এই পুরস্কারের জন্য।

জীবন ও সাহিত্য পরিক্রমা

ডরিস লেসিং। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বয়স্ক পুরস্কার বিজয়ী। এখনও তিনি যেমন স্বভাব উচ্ছল তেমনি সৃজনশীল। তাঁর এ পর্যন্ত শেষ উপন্যাসটি লিখেছেন ২০০৬ সালে (দ্য ক্লেফট)। আজ থেকে ৮৮ বছর আগে ১৯১৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন পারস্যে (অধুনা ইরান) কারমানশাহ শহরে। যার অধুনা নাম বাখতারান।

ডরিস লেসিং যখন জন্মেছিলেন, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য মধ্য গগনে দীপ্যমান। সে সূর্য কখনও অস্ত যেত না। পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তার। আর তা শাসন ও শোষণের জন্য দরকার ছিল বিশাল সৈন্যবাহিনী। ডরিসের পিতা আলফ্রেড কুক্ টেইলর ছিলেন সৈন্য বিভাগের একজন অফিসার। প্রথম মহাযুদ্ধে আহত ও পঙ্গু হয়ে যান। ডরিসের মাতা এমিলি মাউদ টেউলর পেশায় ছিলেন নার্স। যুদ্ধে পঙ্গু পিতা বাখতারানের একটি ব্রিটিশ ব্যাঙ্কে চাকরি গ্রহণ করেন। তখন সেখানেই ডরিসের জন্ম হয়। ডরিসের যখন ছ'বছর বয়স তখনই তাঁর পিতামাতা জীবনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌভাগ্য লাভের প্রত্যাশায় চলে আসেন আফ্রিকার এক ব্রিটিশ কলোনি, রোডেশিয়ায় (অধুনা জিম্বাবোয়ে)। সেখানে তাঁরা একটি খামার বাড়ি ক্রয় করেন। পিতামাতার ইচ্ছা, ডরিস উচ্চশিক্ষা লাভ করবে এবং ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সোসাইটির যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে।

সাত বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হয় একটি ক্যাথলিক স্কুলে। সেখানে নিয়মের কঠিন নিগড়ে স্কুল জীবনে প্রাথমিক স্তরেই ডরিস বিদ্রোহ করেন। পরে পিতামাতা তাঁকে সলব্বেরিতে একটি মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করান। সেখানে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সেই পিতামাতার অমতে প্রচলিত স্কুল কলেজের লেখাপড়ায় চিরতরে সমাপ্তির রেখা টানেন।

এবার শুরু হল কর্মজীবন। স্বাবলম্বী হওয়ার জীবন সংগ্রাম। আর সেই সঙ্গে শুরু হল স্বশিক্ষার আলোকে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির পালা। বদলে গেলে অপ্রাপ্তবয়সেই কর্মজীবনের শুরু বিভিন্ন পেশায় যেমন, শিশু রক্ষক, অফিসের কেরাণী, টেলিফোনিস্ট, স্টেনোগ্রাফার, সাংবাদিক এবং ক্রমে লেখালিখির জগতে প্রবেশ। তাঁর দাম্পত্যজীবন শুরু হওয়ার আগেই তিনি কয়েকটি ছোট গল্প প্রকাশ করে ভবিষ্যত সাহিত্য জীবনের সূচনা পর্বের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১৯৩৯ সালে যখন তাঁর বিশ বছর বয়স, তখন তিনি চার্লস ইউসডনকে বিবাহ করেন। ক্রমে ডরিস দুই সন্তানের জননী (জন এবং জেনি) হন। তাঁদের এই সংসার জীবন বেশিদিন টেকেনি। ছ'বছর পরে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

এরপর ডরিস সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। রোডেশিয়ার একটি মার্কসপন্থী গ্রুপের সঙ্গে একত্র হয়ে বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এবং তখনই তিনি রোডেশিয়ার লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। এই সময়টা ডরিসের স্বশিক্ষার স্মরণীয় সময়। তখনই রোডেশিয়ায় এক জার্মান অ্যাক্টিভিস্ট গডফ্রিড লেসিং -এর সঙ্গে ১৯৪৫ সালে তাঁর বিয়ে হয়। এই বিয়েও বেশিদিনি টেকেনি। ১৯৪৯ সালে একটি পুত্রসন্তান (পিটার) নিয়ে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। তখন এই বছরেই পিটার কে নিয়ে চলে আসেন লন্ডন।

(প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যদিও গডফ্রিড লেসিং -এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ জীবন ক্ষণস্থায়ী, তবু ডরিস লেসিং নামেই বিবাহোত্তর জীবনে তিনি পরিচিত। গডফ্রিড লেসিং সত্তর দশকের শেষের দিকে ঈদি আমিনের উগান্ডায় জার্মান রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে ঈদি আমিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় আমিনের সমর্থকরা তাঁকে হত্যা করে।)

লন্ডন আসার পর থেকেই ডরিস লেসিং সৃজনী সাহিত্যের সৃজনশীলতার একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাছাড়া আদর্শগতভাবে মার্কসীয় মননশীলতায় এবং চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। কমিউনিস্ট পন্থী বিতর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

বইমেলা সৃষ্টিসন্ধান

সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এমনকী ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সভ্য পদ গ্রহণ করেন।

ডরিস লেসিংং দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ার বর্ণবৈষম্য স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ও কণ্ঠে রূঢ় ভাষায় সমালোচনা করেন। ফলে আফ্রিকার শেষ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ দক্ষিণআফ্রিকা এবং রোডেশিয়ায় তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন দুই দেশের সরকার। লেখিকা হিসাবে ইতিমধ্যেই তাঁর প্রথম উপন্যাস, দ্য গ্রাস ইজ সিংগিং প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই একটা আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়ে গিয়েছেন ডরিস লেসিং। এই উপন্যাসটি ১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডন থেকে। রোডেশিয়ার ভিক্টোরিয়ান শ্বেতাঙ্গ সমাজের খামার ক্ষেত্রে মালিক ডিউক টার্নার। তাঁর স্ত্রী মেরি টার্নার। এই শ্বেতাঙ্গ খামার মালিকরা কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের সুলভ শ্রমের দ্বারা খামার ব্যবসায়ে জমিয়ে বসেছেন। কিন্তু মেরি টার্নার তাঁর স্বামীর যৌন শৈত্যের কারণে বিবাহিত জীবনে মোটেই সুখী ছিলেন না। মেরির জীবনে নেমে এলো অতৃপ্ত যৌনক্ষুধার অন্ধকার যন্ত্রণা। সেই অন্ধকার থেকে মুক্তির আলো খুঁজে পেলেন তাঁদের খামারের কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য মাজেসের প্রেমালিঙ্গনে। উপন্যাসটিতে রোডেশিয়ার রোমান্টিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নরনারীর আলেখ্য নিঁখুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেসিং।

ডরিস লেসিংএর অন্য কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'চিলড্রেন অব ভায়োলেন্স'। এই উপন্যাসের পটভূমি মূলত বিশাল এবং কৃষ্ণকায় আফ্রিকার পটভূমিকায় রচিত।

পাঁচ খণ্ডে এই উপন্যাসটি সমাপ্ত। যথা মার্থা ক্যুয়েস্ট, এ প্রপার ম্যারেজ, এ রিপল ফ্রম দ্য স্টর্ম, ল্যান্ডলক্, দ্য ফোর গেট অব দ্য সিটি।

এই উপন্যাস সিরিজের সর্বস্তরেই নায়িকা হলেন মার্থ ক্যুয়েস্ট এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসের আগাগোড়া। যা নারী হিসাবে মার্থার মতো আধুনিক মেয়েদের কাছে আদর্শ বিশেষ। মাথা সংস্কারমুক্ত এক আধুনিক নারী প্রতীক। এই উপন্যাসে লেখিকা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বন্ধন ছিন্নের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন।

১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় ডরিস লেসিং -এর আর একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য গোল্ডেন নোটবুক', নারী আন্দোলনের অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে এই বইটি একটি দৃষ্টান্তসূচক সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরুষ শাসিত সমাজের নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান ও তার বৈষম্য নিয়ে আলোকপাত করেছে অসংখ্য উপন্যাস। কিন্তু ডরিস লেসিং -এর 'দ্য গোল্ডেন নোটবুক' রাজনীতি ও ভাবাবেগকে একত্রে গ্রথিত করে রচিত হয়েছে।

উন্যাসের নায়িকার নাম আনা উলফ্। তাঁর ছিল পাঁচটি নোটবই বা ডাইরি। যার একটির মধ্যে রয়েছে আফিকা সম্বন্ধে নানা তথ্যের সংগ্রহ। কোনওটা শুধু রাজনীতি সম্বন্ধীয় এমনকী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিক তথ্য। কোনও নোটবই কেবল পুরুষের সঙ্গে প্রেম ও যৌন সম্পর্ক বিষয়ক স্বপ্নালু রোমান্টিক চিন্তাভাবনা। এই বহুবিধ ভাবনা চিন্তা ও তথ্যের সংযোজনেই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রকে তাঁর অভিজ্ঞতার দর্পণে স্বকীয়তা দান করেছে। উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক এক জীবন সমীক্ষা।

১৯৭৯—১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টা ডরিস লেসিং লিখেছেন এক থেকে পাঁচখণ্ড পর্যন্ত কল্পবিজ্ঞানের সিরিজ। 'কানোপাস ইন আরগোস: আরসিবস্।' আণবিক বিস্ফোরণের পর, পুনরায় মানবিকতার পুনর্জন্মকে কেন্দ্রকরেই উপন্যাসটি রচিত। পেন্টোলজির একটি প্রথম উপন্যাস। উক্ত বইটিতে সুফিবাদের বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়।

কল্পবিজ্ঞানের পরিকল্পনাতেই তাঁর 'শিকাস্তা' উপন্যাসটিও লেখা। কল্পবিজ্ঞানের পেন্টোলজির পর ১৯৮৫ সালে আবার ফিরে আসেন বাস্তবে। 'দ্য গুড ট্যেররিস্ট' বইটিতে তিনি তুলে ধরেছেন তৎকালীন বামপন্থীদের ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা। একটি অপরিণত নারী চরিত্রের সন্ত্রাসী চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া এবং তার পরিণতিই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। চরম ত্যাগ স্বীকার করেও তাঁর স্খলন রোধ অসম্ভব হয়ে ওঠে।

লেসিং ১৯৯৪ সালে লিখেছেন দুটি বাস্তবমুখী উপন্যাস 'আন্ডার মাই স্কিন' এবং 'ওয়াকিং ইন দ্য সেড'। যা লেখিকা হিসেবে তাঁকে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। বই দুটি তাঁর আত্মজীবনীর ছায়া অবলম্বনে লিখিত। এখানে লেসিং শুধু তাঁর জীবনের ছবিই তুলে ধরেননি, উপরন্তু তাঁর যুগটাকে তুলে ধরেছেন। রোডেশিয়ায় তাঁর বাল্যকাল, পিতামাতার সঙ্গে তাঁর ফার্মের অর্থাৎ খামার বাড়ির জীবন। যেখানে তাঁর শৈশবজীবন ভয়াবহ এক নিসঙ্গতার মধ্যে কেটেছে। তাঁর কর্মজীবন ও লেখালেখির ঔপনিবেশিক সূর্যের অস্তগমনের যুগ। উপনিবেশের অধীনতা মুক্তির যুগ।

তারপরে লিখেছেন, 'দ্য সুইটেস্ট ড্রিম' যেন তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাসের ক্রমবিকাশ। আরো বিস্তৃতি। তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং ভালোবাসা ও প্রেম।

লেসিং -এর লেখিকা জীবনের বর্ণনা এসেছে 'দ্য সামার বিফোর দ্য ডার্ক' বইটিতে। ১৯৮৮ সালে লিখিত 'দ্য ফিফথ্ চাইল্ড' বইটিতে লেসিং লিখেছেন, নারীর সত্যিকারের মুক্তি এবং স্বাধীনতার স্বরূপ। নারীর স্বাধিকার ও মুক্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং যৌন আকঙ্ক্ষার স্বাধীন চর্চা। ডরিস লেসিং লিখেছেন ৮০টি বই তার মধ্যে ষাটটি গল্প সংকলন ও উপন্যাস। তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। নারীবাদী লেখিকা হিসেবে কখনও তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরতে চান না। কেউ তাঁকে এই পরিচয়ে তুলে ধরুক তাতে তিনি খুশি হন না। নোবেল পুরস্কার প্রসঙ্গে সুইডিস আকাদেমির মন্তব্যে যে তিনি খুশি হননি, তা শুনে তাঁর তাৎক্ষণিক মন্তব্য ছিল।

শেষ পর্যন্ত ডরিস লেসিং নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন এবং তা সম্ভব হয়েছে তাঁর দীর্ঘায়ুর সুবাদে। বিগত ত্রিশ বছর যাবত তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য সুপারিশ পেয়ে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত লেসিং নোবেল পুরস্কারের প্রত্যাশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি নোবেল ছাড়া ইউরোপের সব বিখ্যাত পুরস্কারই পেয়েছেন। তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তবু শেষ পর্যন্ত নোবেল পেয়ে তিনি বলেন —It is a Royal Flush.